শির্ক কী ও কেন?

বিভাগ/অধ্যায়ঃ চতুর্থ পরিচ্ছেদ

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ ড. মুহাম্মদ মুয্‌যাম্মিল আলী

পরিচালনাগত শির্ক

ব্যবহার বা পরিচালনাগত শির্কের পরিচিতি সম্পর্কে প্রথম অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে এর পরিচিতি সম্পর্কে সংক্ষেপে শুধু এটুকু বলতে চাই যে, এ বিশ্বজগতের মালিকানাতে যেমন আল্লাহর কোনো শরীক নেই, তেমনি গাউছ, কুতুব ও আবদাল নামে এর ছোট থেকে বড় কোনো কিছু পরিচালনার ক্ষেত্রেও তাঁর কোনো শরীক বা সাহায্যকারী নেই। তিনি যেমন বিজ্ঞতা ও প্রজ্ঞার সাথে তাঁর এ জগতের সবকিছু পরিচালনা করেন, ঠিক তেমনিভাবে তিনি পরজগতও পরিচালনা করবেন। এ সৃষ্টিজগতের কারো পক্ষে তাঁর পরিচালনা কর্মে তাঁর পূর্ব অনুমতি ব্যতীত কারো ব্যাপারে শাফা'আত করারও কোনো অধিকার নেই। এ জগতে মানুষ তাঁরই সৃষ্ট একটি সম্মানিত জীব। তাদের ভাগ্যের ভাল-মন্দ সব কিছুই তিনি নিয়ন্ত্রণ করেন। হিকমতের ভিত্তিতে যাকে ইচ্ছা প্রভূত কল্যাণ বা অকল্যাণ দিয়ে থাকেন।

তাই অবস্থা পরিবর্তনের জন্য অপর কোনো মানুষের মধ্যস্থতা পরিহার করে সরাসরি কেবল তাঁরই নিকট বিনয়ের সাথে চাইতে হবে। মানুষেরা পরস্পরের পূর্ব অনুমতি ছাড়াই একে অপরের কাছে অন্যের জন্য শাফা'আত করতে পারে, তারা পারস্পরিক প্রয়োজনে একে অপরের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে একে অপরের সুপারিশ অনুযায়ী কাজও করে; কিন্তু আল্লাহর বিষয়টি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন, তাঁর সামনে তাঁর পূর্ব অনুমতি ব্যতীত শাফা'আত করারও কেউ নেই, কারো নাম শুনেও তিনি প্রভাবিত হন না। তাঁর কাছে কিছু চাইতে হলে তাঁর উত্তম নামাবলীর মাধ্যমে বা ওসীলার অন্যান্য বৈধ পন্থায় তা চাইতে হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বা অপর কোনো ওলিদের নামের ওসীলায় নয়; কেননা, তাঁর নিকট কারো নামের ওসীলায় কিছু চাওয়া তাঁর সাথে মানবীয় আচরণ ও তাঁকে তাঁর সৃষ্টির দ্বারা প্রভাবিত করার শামিল।

কোনো মানুষ বা কোনো বস্তু আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছার বাইরে কারো কোনো উপকার বা অপকার করতে পারে না; সে-জন্য জীবিত কোনো মানুষ বা কোনো বস্তুর দ্বারা কোনো উপকার বা অপকার অর্জিত হলে সে উপকার বা অপকারের কৃতিত্ব সে মানুষ বা সে বস্তুকে দেয়া যাবে না। কেউ যদি এর পূর্ণ কৃতিত্ব সে মানুষ বা সে বস্তুর বলে মনে করে, তবে এতে সে আল্লাহর রুবূবিয়্যাতে সে মানুষ বা সে বস্তুকে শরীক করে নিল বলে গণ্য হবে এবং তার এ মনে করাটি শর'য়ী দৃষ্টিতে শির্কে আকবার হিসাবে গণ্য হবে।

আল্লাহর পরিচালনা কর্মে কোনো হস্তক্ষেপকারী এ ধরাতে না থাকা সত্ত্বেও এবং তাঁর ইচ্ছার বাইরে কারো কোনো উপকার বা অপকার করার মত কেউ না থাকা সত্ত্বেও আমাদের মুসলিম সমাজে এমন সব চিন্তা, চেতনা ও কর্ম রয়েছে যা এ কথা প্রমাণ করে যে, আল্লাহর পরিচালনা কর্মে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -সহ বিভিন্ন ওলিগণ হস্তক্ষেপ করতে পারেন। তিনি (আল্লাহ) তাঁর নবী ও অলিগণের নামের দ্বারা প্রভাবিত হন। তাঁরা মরে গেলেও তাঁদের রূহানী শক্তি বলে তাঁরা ইচ্ছা করলেই মানুষের যে কোনো উপকার করতে পারেন। না'উজু বিল্লাহ।

মুসলিম সমাজে প্রচলিত এ ধরনের কিছু পরিচালনাগত শির্কের উদাহরণ নিম্নে বর্ণিত হলো।

১. বিপদ মুক্তির জন্য দরূদ বা খতমে নারী পাঠ করা:

বিপদ মুক্তির জন্য ওসীলা করার শরী'আত নির্দেশিত বৈধ পন্থা রয়েছে, যার কিছু ইঙ্গিত একটু আগেই দেয়া হয়েছে। তবে এর বিস্তারিত বর্ণনা আমরা এ বই এর তৃতীয় অধ্যায়ে প্রদান করবো ইন-শাআল্লাহ। কিন্তু আমাদের দেশে ওসীলার নামে শরী'আত অনুমোদিত পন্থার বাইরে সূফীদের কর্তৃক উদ্ভাবিত দুরূদে নারী বা খতমে নারী নামে সাধারণত মাদ্রাসার শিক্ষকদের মাঝে অপর একটি ওসীলার বহুল প্রচলন রয়েছে। দরূদটি নিম্নরূপ :

"اللَّهُمَّ صَلِّ صَلَاةً كَامِلَةً وَسَلِّمْ تَسْلِيمًا تَامًّا عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الَّذِيْ تَنْحَلُّ بِهِ الْعُقَدُ وَ تَنْفَرِجُ بِهِ الْكُرَبُ ، وَتُقْضَى بِهِ الْحَوَائِجُ ، وَتُنَالُ بِهِ الرَّغَائِبُ وَحُسْنُ الْخَوَاتِمَ، وَ يُسْتَسْقَى الغَمَامُ بِوُجْهِهِ الْكَرِيْمِ...."

"হে আল্লাহ! আমাদের নেতা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর অনেক অনেক রহমত ও শান্তি বর্ষণ করুন, যার দ্বারা যাবতীয় সমস্যার গিঁট খুলে যায়, বিপদাপদ দূরীভূত হয়, সকল প্রয়োজন পূর্ণ হয় এবং সকল কামনা, বাসনা ও ভাল পরিণতি অর্জিত হয়। যার মর্যাদাপূর্ণ মুখমণ্ডল অথবা তাঁর জাতের ওসীলা করে বৃষ্টি কামনা করা হয়।"

এ দরূদকে এ নামে নামকরণ করার কারণ হিসেবে বলা হয়ে থাকে যে, আগুন যেমন তাতে নিক্ষিপ্ত বস্তুকে পুড়ে ছাই করে দেয়, তেমনিভাবে এ দরূদটি ৪৪৪৪ বার পাঠ করলে নাকি তাও সকল বিপদাপদকে আগুনের মত পুড়ে ছাই করে দেয়। এ দুরূদের বাক্যগুলোর মধ্যে আমরা বাহ্যতই দেখতে পাচ্ছি যে, তাতে বিপদ মুক্তির জন্য আল্লাহ তা'আলার বদলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহায্য গ্রহণ করা হয়েছে। আর রাসূলের ব্যাপারে এ ধারণা পোষণ করা হচ্ছে যে, তাঁর দ্বারা যাবতীয় উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়ে যায়। অথচ তিনি বা কারো ব্যাপারে এ জাতীয় ধারণা করা আল্লাহর পরিচালনা কর্মে হস্তক্ষেপ করার শামিল। সে জন্য আল্লামা জাযাইরী[1] (মৃত ১৯৯৯ খ্রি.) এ দরূদ প্রসঙ্গে বলেন :

"إن هذه الصلاة لا تجوز؛لأن فيها إسناد حل العقد ...إلى آخره إلى الرسول r وهذا شرك أو كفر"

"এ দরূদ পাঠ করা জায়েয নয়। কারণ; এতে সমস্যার গিঁট খোলাসহ দো'আয় বর্ণিত অন্যান্য বিষয়াদিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে সম্পর্কযুক্ত করা হয়েছে। আর এ ধরনের কথা শির্ক অথবা কুফর এর অন্তর্গত"।[2]

ইবনে আব্দিল হাদী (৭০৪-৭৪৪ হি:) বলেন: "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সম্মান ও মর্যাদার ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করার মানসে তাঁর ব্যাপারে এ বিশ্বাস পোষণ করা যে, তিনি গায়েব সম্পর্কে জানেন, কিছু দিতেও পারেন এবং দিতে বারণও করতে পারেন, যারা বিপদের সময় আল্লাহকে ব্যতীত তাঁকে আহ্বান করে তিনি তাদের কল্যাণার্জন ও অকল্যাণ দূরীকরণের ক্ষমতা রাখেন, আল্লাহ তা'আলার পূর্ব অনুমতি ছাড়াই তিনি যে কারো ব্যাপারে শাফা'আত করতে পারেন এবং যাকে ইচ্ছা জান্নাতে প্রবেশ করাতে পারবেন, তাঁর সম্মানের ক্ষেত্রে এ ধরনের বাড়াবাড়ি করা অতি মাত্রায় শির্ক করা ও গোটা দ্বীন থেকে বেরিয়ে যাওয়ারই শামিল।"[3]

২. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রশংসা ও স্তুতি বর্ণনা করে তাঁকে আল্লাহর অবতারে পরিণত করা :

আমাদের দেশে এমনও কিছু মানুষ রয়েছেন যারা রাসূলুল্লাহ-সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অতি সম্মান দেখাতে গিয়ে তাঁর প্রশংসায় এমন সব কথা-বার্তা বলেন যা তাঁকে আল্লাহ ও প্রতিপালকের মর্যাদায় উন্নীত করে।

মনে হয় যেন তিনি আর আল্লাহর মধ্যে কোনো পার্থক্যই নেই। আল্লাহ নিজেই যেন মুহাম্মদ-সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আকৃতিতে এ পৃথিবীতে নিজেকে প্রকাশ করেছেন এবং তিনিই যেন আল্লাহর হয়ে এ-জগত পরিচালনা করেন। তাদের এ-জাতীয় শির্কী কথা-বার্তার কিছু উদাহরণ নিম্নে প্রদত্ত হলো:

ক)

جوتها عرش پرمستوي خدا هو کر** وه أتر يرا زمين مين مصطفى هو کر

'যিনি খোদারূপে আরশের উপর ছিলেন, তিনি পৃথিবীতে মুস্তাফারূপে অবতরণ করেন'।

খ) 'আরশে যিনি আহাদ ছিলেন, ফরশে (যমিনে) তিনি আহমদ হলেন''।

গ) 'আহাদ আর আহমদের মাঝে শুধু মীম অক্ষরের পার্থক্য রয়েছে, মীমকে মাঝ থেকে সরিয়ে দিলে আহাদ আর আহমদকে একই দেখতে পাবে'।

ঘ) 'আহমদের ঐ মীমের পর্দা উঠিয়ে দে রে মন

দেখবি সেথা বিরাজ করেছে আহাদ নিরঞ্জন'।

ঙ)

محمد با شكل عرب آمده است ** عين را حذف كن كه رب آمده است

'মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-একজন আরবী মানুষের আকৃতিতে আগমন করেছেন, আরব শব্দের 'আইন' অক্ষরকে বিলুপ্ত করে দিলে দেখতে পাবে প্রকৃতপক্ষে রবই আগমন করেছেন'।

চ) 'بظاهر محمد بباطن خدا' মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাহ্যত মুহাম্মদ হয়ে থাকলেও গোপনে তিনি খোদা।'

ছ) محمد گرچہ خدا نهين وليكن خدا سے جدا بهى نهين "মুহাম্মদ যদিও খোদা নন, তবে তিনি খোদা থেকে পৃথকও নন।"

জ) رسول خدا خود خدا بنكے آيا "আল্লাহর রাসূল স্বয়ং খোদা হয়ে আগমন করেছিলেন।"

ঝ) خالق كل نے آپكو مالك كل بنا ديا "সব কিছুর সৃষ্টিকর্তা আপনাকে সব কিছুর মালিক বানিয়ে দিয়েছেন।"[4]

মাইজভাণ্ডারের অনুসারীগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে আল্লাহ বলে বিশ্বাস করার পাশাপাশি তাদের পীর আহমদুল্লাহ ভাণ্ডারীকেও তারা আল্লাহ বলে বিশ্বাস করেন। তাই তাকে লক্ষ্য করে তারা বলেন : "একের ভিতরে তিনের খেলা বুঝব কী করে, তুমি আল্লাহ, তুমি রাসূল, তুমি ভাণ্ডারী।"

তাদের ধারণা মতে, আল্লাহ নিজেই একবার রাসূল হিসেবে আবার ভাণ্ডারী হিসেবে আগমন করেছিলেন। নাউজুবিল্লাহ।

উল্লেখ্য যে, উর্দু ও ফার্সী ভাষায় লিখিত কবিতাগুলোর লেখকগণ পরদেশী হলেও আমাদের দেশের ভ্রান্ত তরীকতপন্থীগণ এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর স্তুতি বর্ণনার ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘনকারীগণ কবিতার এ পংক্তিগুলো খুব ভালো করেই রপ্ত করে থাকেন এবং সাধারণত ১২ ই রবীউল আউয়াল উপলক্ষে য

আয়োজিত ঈদে মিলাদুন্নবী উৎসবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ভালবাসা প্রকাশার্থে তারা এ সব গাইতে থাকেন। ইসলামের দৃষ্টিতে অবতারবাদ একটি শির্ক ও কুফরি বিশ্বাস হয়ে থাকলেও তাদের এ সব ধ্যান-ধারণা ও কথা বার্তার দ্বারা মনে হয় যে, তারা খ্রিস্টান ও হিন্দুদের ন্যায় অবতারবাদে বিশ্বাসী। তাদের মাঝে এ জাতীয় ধারণা ও বিশ্বাস যে হিন্দু ও খ্রিস্টানদের মধ্য থেকে অনুপ্রবেশ করেছে, তা সহজেই অনুমান করা যায়।

৩. অলিগণের মধ্যে যারা গউছ ও কুতুব তারা পৃথিবী পরিচালনা করেন বলে বিশ্বাস করা :

আমাদের দেশে ভ্রান্ত তরীকত ও মা'রিফাতপন্থীদের মাঝে এমন একটি অদ্ভূত বিশ্বাস রয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর অলিগণের মধ্য থেকে কতিপয় লোকদেরকে পৃথিবীর বিভিন্ন কর্ম পরিচালনা জন্য গউছ, কুতুব ও আব্দাল ইত্যাদি পদে নিয়োগ দিয়ে থাকেন। সরকারী ক্ষমতা লাভ, প্রশাসনের বিভিন্ন পদের নিয়োগ, বদলী ও অপসারণ তাঁদেরই ইশারায় নাকি হয়ে থাকে। আল্লাহ তা'আলা তাঁদের হাতে কাউকে কিছু দেয়া বা না দেয়া, কারো কল্যাণ বা অকল্যাণ করার ক্ষমতা দান করে থাকেন। 'দেওয়ানুস সালেহীন' নামে তাঁদের নাকি একটি পরামর্শ পরিষদও রয়েছে।

সেখানে বসেই তাঁরা যাবতীয় বিষয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং সে অনুযায়ী ফরমান জারী করেন। এমনকি তাঁদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ীই নাকি আদালতের যাবতীয় রায়সমূহ জারী হয়ে থাকে।[5] এ-জাতীয় ধারণার পরিপ্রেক্ষিতেই বড় পীর আব্দুল কাদির জীলানীকে 'গউছে আ'যম' (বড় উদ্ধারকারী) বলে নামকরণ করা হয়েছে। এ ধারণার ভিত্তিতেই পীরদের ভক্তগণ তাদের পীর সাহেবদেরকে 'যামানার কুতুব' নামে খেতাব দিয়ে থাকেন। গাউছ ও কুতুব সম্পর্কিত এ বিশ্বাস যে শুধু সাধারণ মানুষের মধ্যেই রয়েছে, তা নয়; এ ধরনের বিশ্বাস অনেক আলেমদের মাঝেও রয়েছে। যার জ্বলন্ত প্রমাণ হলেন জমঈয়াতুল মুদাররিছীনের সভাপতি ও ইনকিলাব পত্রিকার মালিক মাওলানা আব্দুল মান্নান।

তিনি তাঁর পত্রিকায় এ মর্মে একটি প্রবন্ধ বিগত ২৮/৯/১৯৯৭ সালে প্রকাশ করেছিলেন। যার উদ্ধৃতি প্রথম অধ্যায়ে প্রদান করা হয়েছে। গউছ ও কুতুব সম্পর্কিত এ জাতীয় চিন্তাধারা ভারতবর্ষের মুসলিম সমাজ ব্যতীত অন্যান্য মুসলিম দেশের মুসলিমদের মাঝে নেই। এ-জাতীয় চিন্তাধারা তাদের মধ্যে প্রসারিত হওয়ার পিছনে কিছু হাদীস রয়েছে; যে-গুলো দুর্বল অথবা মাওযু' হওয়ার ব্যাপারে হাদীস বিশেষজ্ঞগণের মাঝে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।[6] ইমাম ইবনে তাইমিয়্যাঃ এ-জাতীয় বিশ্বাস সম্পর্কে বলেন,

"وهذا كله باطل لا أصل له في كتاب الله ولا سنة رسوله، ولا قاله أحد من سلف الأمة، ولا أئمتها، ولا من المشايخ الكبار المتقدمين الذين يصلحون للاقتداء بهم ..."

"এ সব বাতিল বিশ্বাস। আল্লাহর কিতাব এবং তাঁর রাসূলের সুন্নাতে এ সবের কোনই ভিত্তি নেই, মুসলিম উম্মাহের অগ্রবর্তীদের মধ্যকার কেউ তা বলেন নি। তাদের ইমামগণও তা বলেন নি এবং অনুসরণীয় অগ্রবর্তী বড় বড় পীর-মাশায়েখগণও এ সব বলেন নি..."।[7]

এ সম্পর্কে আল্লামা সুন'উল্লাহিল হালাবী হানাফী বলেন :[8]

إن مثل هذا الاعتقاد من موضوعات إفك المسلمين

"গউছ, কুতুব ও আব্দাল ইত্যাদি সম্পর্কিত বিশ্বাস মুসলিমদের মিথ্যা রচিত বিশ্বাসের অন্তর্গত।"[9]

আমাদের দেশে এমন সব লোকও রয়েছেন যারা এ বিশ্বাস করেন যে, মহান আল্লাহ অলিগণের আকৃতিতে

আত্মপ্রকাশ করে থাকেন বিধায়, অলিগণের পরিচালনাগত শক্তি সীমাহীন হয়ে থাকে। তারা আরো বিশ্বাস করেন যে, ইতোপূর্বে আল্লাহ তা'আলা বাগদাদ, আজমীর ও মাইজভাণ্ডারে নিজের আত্মপ্রকাশ ঘটিয়েছিলেন। সে জন্য মাইজভাণ্ডারের ভক্তদেরকে এ জাতীয় ধারণা প্রকাশ করে কবিতা লিখতেও দেখা যায়। যেমন মাইজভাণ্ডারের এক হিন্দু ভক্ত লিখেছে:

হায়রে দয়াল ভাণ্ডারী।

দোজাহানের মালিক আমার জগতের কাণ্ডারী।

(মাওলারে) তোমার নাম নিয়ে দিলাম ভব সাগরে পাড়ি।

পুলসেরাতে পার করিও দিয়ে চরণ তরী।

(মাওলারে) মানুষরূপে এলে চিনতে না পারি।

তুমি যদি দয়া কর এক পলকে তরি।

(মাওলারে) মদিনা, বাগদাদ, আজমিরের খেলা সাঙ্গ করি
চট্রগ্রামে রোশন করিলা হইয়া ভাণ্ডারী।

(মাওলারে) নাম শুনে তোমার দরজায় হয়েছি ভিখারী।

রমেশ বলে দোহাই তোমার এক নজরে চাও ফিরি।"[10]

কী আশ্চর্য যে, এ লোকটি একজন হিন্দু ধর্মাবলম্বী হওয়া সত্ত্বেও আহমদুল্লাহ মাইজভাণ্ডারীর একজন প্রথম শ্রেণীর উপাসকে পরিণত হয়েছে। হিন্দুরা যেমন তাদের রাম, কৃষ্ণ ও শিব ইত্যাদি দেবতাদের ব্যাপারে এরা আল্লাহর অবতার বলে বিশ্বাস করে, ঠিক তেমনি এ ব্যক্তি মাইজভাণ্ডারীর বেলায়ও একই ধারণা পোষণ করছে। সে তার অপর এক কবিতায় বলেছে : ভাণ্ডারীর পা নিয়ে সর্বদা চিন্তা করলে কখনও বিপদ হয় না। মানুষের পাপ মোচনের জন্যই মাইজভাণ্ডারে তাঁর শুভাগমন হয়েছিল। ভাণ্ডারীর পায়ের কথা চিন্তা করলে কা'বা, কাশী ও বৃন্দাবন সবই পাওয়া যায়। তাঁর প্রতি ভক্তি রেখে মুখে ভাণ্ডারী নাম জপ করলে আখেরাতে মুক্তি পাওয়া যাবে; কেননা, আখেরাতে ভাণ্ডারী ব্যতীত পার পাবার কোনো উপায় নেই। নিম্নে বর্ণিত তার কবিতার দ্বারা তার এ সব বক্তব্য প্রকাশিত হয়েছে। যেমন সে বলেছে :

ভাব অবোধ মন হরদমে ভাণ্ডারী চরণ।

ঐ চরণে শরণ নিলে বিপদ হয় না কদাচন।

মাইজভাণ্ডারীর জোর কদমে কী ফল আছে জান না,

পাপীর ভাগ্যে দেখা দিল ভাণ্ডারেতে মাওলানা;

ঐ কদম বরকতে পাবি কা'বা কাশী বৃন্দাবন।

মাওলার প্রতি ভক্তি রাখ মুখে ডাক ভাণ্ডারী,

মাওলা বিনে আর কেহ নেই নিতে যাবে পার করি,"।[11]

শুধু এখানেই শেষ নয়, সে আরো দূর অগ্রসর হয়ে ভাণ্ডারীকে মানুষের ভাগ্যের উপর হস্তক্ষেপকারী ও তাদের

যাবতীয় সুখ-দুঃখের মালিক বানিয়ে দিয়েছে। এ পর্যায়ে সে বলেছে:

কালি তোমার কলম তোমার, সুখ-দুঃখ লিখা সকল তোমার,

কে খন্ডাবে তুমি না খন্ডালে।[12]

মাইজভাণ্ডারের মুসলিম ভক্তরা হয়তো উপর্যুক্ত সকল বিষয়ে এ ব্যক্তির চিন্তাধারার সাথে একমত নাও হতে পারেন। তবে একজন মানুষের পথভ্রষ্টতার জন্য তো তার একটি ভ্রান্ত ধারণাই যথেষ্ট। মাইজভাণ্ডারের বার্ষিক ওরসে যে সকল মুসলিমরা তাদের ভাগ্য পরিবর্তন ও সমস্যাদির সমাধান পাবার জন্য মানতের জীব, জন্তু ও নগদ টাকা অকাতরে বিলিয়ে দেন, সে সবই তাদের শির্কী কর্মে লিপ্ত থাকার দলীল হওয়ার জন্য যথেষ্ট। সেখানকার বার্ষিক ওরসে যে হারে হিন্দু, মুসলিম নির্বিশেষে সবাই ভিড় জমায়, তাতে মনে হয় মাইজভাণ্ডার যেন সকল ধর্মাবলম্বী লোকদের জন্য একটি মহামিলন কেন্দ্র। এ সম্পর্কে সে ব্যক্তির ভাষ্য নিম্নরূপ:

‘‘আয়রে আয় রহমান’ মনজেলে মাইজভাণ্ডার,

ঔরস মেলা প্রেমের খেলা দেখবি আশেকের গোলজার।

দুই দিকে দুই রওজা বাত্তি জ্বলে অনিবার,

হালকা তালে আশেক নাচে আল্লাহু জিকির সার,

উট, গরু, গয়াল, মৈষ সংখ্যা নাই ছাগল ভেড়ার,

মাঝে মাঝে নলকুপ আছে পিঁপাসী লোক পানি খায়।

কেহ ছিটে আতর গোলাপ বাবাজানের হুজুরায়,

বাবাজানের পশ্চিম পার্শ্বে রওজা শাজাদার,

কেহ রান্ধে কেহ খাওয়ায় খেদমতে আছে মশগুল,

নানা রকম বাদ্য বাজে হক ভাণ্ডারী শব্দমূল,

হিন্দু, মুসলিম, খৃষ্টান, বৌদ্ধ মিলন কেন্দ্র প্রেম দরবার।’’[13]

ওলিগণ কি মানুষের কল্যাণ করতে পারেন?

বস্তুত আমাদের দেশের অধিকাংশ মুসলিমদের কবরে যাওয়ার কারণ ও উদ্দেশ্য নিয়ে গবেষণা করে আমার কাছে যা প্রতীয়মান হয়েছে তা হলো-আউলিয়া, পীর ও দরবেশদের অধিকাংশ ভক্তরা এ বিশ্বাসের ক্ষেত্রে একমত যে, আউলিয়া ও দরবেশগণের জীবন আর মৃত্যু সবই সমান। কেননা, প্রকৃতপক্ষে তাঁরা মরেন না। বাহ্যিক দৃষ্টিতে মৃত্যুর মাধ্যমে তাঁরা ইহজগত থেকে ইন্তেকাল করেন বা স্থানান্তরিত হয়ে আল্লাহর সান্নিধ্যে চলে যান। এ সময়ে তাঁদের রূহানী শক্তি পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি হয়, যার ফলে পৃথিবীর যে কোনো স্থান থেকে তাঁদেরকে আহ্বান করলে তাঁরা তা শুনতে পারেন এবং মানুষের যে কোনো কল্যাণার্জন বা অকল্যাণ দূরীকরণ করতে পারেন। এ ধারণার পরিপ্রেক্ষিতেই তারা তাদের কাছে তাদের পার্থিব ও পরকালীন যাবতীয় প্রয়োজনাদি নিয়ে আগমন করেন। রোগীরা যায় রোগ মুক্তির জন্য, সন্তানহীনরা যায় সন্তান লাভের জন্য, বিপন্নরা যায় বিপদ মুক্তির জন্য, চাকুরীহীনরা যায় চাকরী লাভের জন্য, অপরাধীরা যায় ক্ষমা প্রাপ্তির জন্য; নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বীরা নির্বাচনে জয়ী

হওয়ার জন্য। তাদের কবরে যাওয়ার পার্থিব উদ্দেশ্য বিভিন্ন রকমের হলেও সকলের পরকালীন উদ্দেশ্য তাঁদের শাফা'আতের মাধ্যমে পরকালীন মুক্তি।

অনেকে মনে করে খাজা মঈনুদ্দিন চিশতির কবর থেকে ফয়েজ ও বরকত উপচে পড়ছে। সেখানে যে যে উদ্দেশ্যেই তাঁকে আহ্বান করে, তাদের সকলের জন্যেই তাঁর দু'হাত প্রশস্ত হয়ে রয়েছে। এভাবে "কেউ ফিরে না খালি হাতে খাজা তোমার দরবার হতে" এ বাক্যটি তাঁর ভক্তদের নিকট একটি শ্লোগানে পরিণত হয়েছে। তারা ওরস উপলক্ষে তাদের দাওয়াতী চিঠি-পত্রে এ জাতীয় শ্লোগান লিখে থাকেন। যেমন জনৈক কাজী মাহবুবুল আলম তার এক দাওয়াতী পত্রে লিখেছেন : "তাহার এতই দয়া কেহ তাহার দরবার হইতে খালি হাতে ফেরে না। ওলি আল্লাহর নেক দৃষ্টি বিদ্যুতের ন্যায় মুহূর্তেই আপনার ভাগ্য পরিবর্তন করিতে পারে এবং আপনাকে শত বৎসর এবাদতের উর্ধ্বে তুলে দিতে পারে। আপনি খাজা সাহেবের নেক দৃষ্টি লাভ করুন।"[14]

খাজা মঈনুদ্দিন চিশতির ব্যাপারে তাঁর ভক্তদের ধারণা হচ্ছে-এক সময় আল্লাহ তাঁর নবীকে সব কিছু পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন। এরপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর এ দায়িত্ব অর্পণ করেছেন খাজা মঈনুদ্দিন চিশতিকে। তাদের এ জাতীয় ধারণা প্রকাশিত হয়েছে তাঁর প্রশংসায় নির্মিত বাজারজাতকৃত গানের কেসেটে। যেমন তারা বলে থাকে :

খোদার ধন নবীকে দিয়া খোদা গেলেন খালি হইয়া

নবীর ধন খাজাকে দিয়া নবী গেলেন খালি হইয়া

খাজারে তোর দরবার হতে কেউ ফিরে না খালি হাতে।

অলিগণের ব্যাপারে তাদের আরো ধারণা হচ্ছে-তাঁরা সকল অসাধ্যকে সাধন করতে পারেন। সে-জন্যে তাদেরকে আল্লাহর রহমতের উপর ভরসা করার পরিবর্তে ওলিদের করুণার উপর ভরসা করতে দেখা যায়। যেমন এক ব্যক্তি তার মনের এ-জাতীয় অভিব্যক্তি প্রকাশ করতে গিয়ে বলেছে : "খোদারই পেয়ারা ওলি যে জন সংসারে, অসাধ্য সাধন করিতে সে পারে, তোমার দয়া না হলে বাবা আমার হবে কী উপায়।"

অপর এক ব্যক্তি খাজা মঈনুদ্দিন চিশতির বার্ষিক ওরসে শরীক হওয়ার জন্য সাধারণ জনগণকে আহ্বান করতে গিয়ে বলেছে : "গরীব নেওয়াজ যাহার দরবারে সর্বদা ফয়েজের সমুদ্র উছলিয়া পড়ে, সেই দয়ালু খাজা বাবার দরবারে আপনিও আসুন আল্লাহর রহমত পাইতে ও রোগ শোক দুঃখ দারিদ্রতা হইতে মুক্তি পাইতে। দীন ও দুনিয়ার পরম শান্তি লাভ করিতে ওরস মোবারকে শরীক হইয়া আপনিও ফয়েজ হাসিল করুন।"[15]

ওরস উপলক্ষে আজমীর হতে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত এক দাওয়াতী পত্রে ওরসের মাহাত্ম্য বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে: "উরশ মোবারক এক সৌন্দর্য্য ও রহমতের দৃশ্য জানিবেন। এই রহমতের সময় আউলিয়া একরাম হইতে ফয়েজ বরকত হাসিল করার সময় ঐ পবিত্র সময় খাজা বাবার রূহানী ফয়েজ অগণিত ভাবে বিতরণ হইয়া থাকে, সকল আশেকীনরা ঐ নেক সময়ে সকল মনো কামনা পূরা করিয়া থাকেন এবং নেক সময়ে বাবার দরবার হইতে কেহ খালী হাতে ফেরেন না।"[16]

নোয়াখালী জেলার মহীউদ্দিন এখলাসপুরীর ভক্তরা তার ব্যাপারে যে ধারণা পোষণ করে, তা যেন অতীতের সকল ওলিগণ কে অতিক্রম করে গেছে। তারা তার ব্যাপারে যে সব ধারণা পোষণ করে তা তাদের ওরস উপলক্ষে প্রকাশিত এক দাওয়াতী পোস্টারে এ ভাবে লিখিত রয়েছে: "...তিনি (মহীউদ্দিন) তাঁর জীবদ্দশায় জনগণের কল্যাণ

সাধন করে গেছেন, এখনও (মৃত্যুর পরও) তিনি মানুষের কল্যাণ করে যাচ্ছেন। তিনি মানুষের দুঃখ দূরীকারী (গউছ) ছিলেন। তার হাতে দেশের বিচার ও শাসন ক্ষমতা ছিল। চট্রগ্রাম, নোয়াখালী, বরিশাল ও খুলনা জেলার উপকূলীয় এলাকায় সমুদ্রকে তার তাণ্ডবলীলা থেকে তিনি বারণ করেছিলেন। যার ফলে সে সব জেলার উপকূলীয় এলাকা ধীরে ধীরে বর্ধিত হয়েছে। তার নিকট ৮৬ হাজার গউছ, কুতুব, আবদাল, নজীব ও আখইয়ার ইত্যাদির নেতৃত্বদানের রূহানী ও বাতেনী যোগ্যতা ছিল। কমপক্ষে আট হাজার ধনী, ব্যবসায়ী, সমাজের নেতৃত্বদানকারী ও শিল্পপতিরা তার মাধ্যমে তাদের জীবনে শান্তি লাভ করেছেন।''

কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্য পরিবর্তন : পীর, অলি, দরবেশ ও সাধারণ মানুষ নির্বিশেষে বিনা সফরে যাদের কবর যিয়ারত করা যায়, তাদের কবর যিয়ারতের অনুমতি প্রদানের পিছনে শরী'আতের উদ্দেশ্য হচ্ছে কবরস্থ ব্যক্তির জন্য মাগফেরাত কামনা করে দো'আ করা এবং নিজের শেষ পরিণতি ও আখেরাতকে স্মরণ করা। মানুষেরা কবর যিয়ারতে গিয়ে শরী'আত বিরোধী কর্ম করে বিধায়, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক সময় কবর যিয়ারত নিষিদ্ধ করে দিয়েছিলেন। কবর যিয়ারতের পিছনে শরী'আতের যে উদ্দেশ্য রয়েছে সে সম্পর্কে জনগণের অবগতির পর পরবর্তী এক সময়ে তিনি পুনরায় তা যিয়ারতের অনুমতি প্রদান করেন। তিনি এ প্রসঙ্গে বলেন:

«كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمِ الْآخِرَةَ»

''আমি তোমাদেরকে কবর যিয়ারত করতে (এক সময়) নিষেধ করেছিলাম, এখন তোমরা তা যিয়ারত করো; কেননা, তা তোমাদেরকে আখেরাত স্মরণ করিয়ে দেয়।''[17]

কিন্তু পীর ও ওলীদের ভক্তদের অবস্থা বিচার করলে দেখা যায়, তারা কবর যিয়ারতের মূল উদ্দেশ্যকে সম্পূর্ণভাবে ভিন্ন উদ্দেশ্যে প্রবাহিত করে দিয়েছে। তারা কবরবাসী ওলির প্রয়োজন পূরণের বদলে তাঁদের কবরকে নিজেদের প্রয়োজন পূরণের স্থানে পরিণত করেছে। তারা মনে করছে- ওলীদের জন্য মাগফিরাত কামনা ও তাঁদের জন্য দো'আ করার কোনো প্রয়োজন নেই; কেননা, তারাতো আল্লাহর নৈকট্য লাভে ধন্য হয়ে গেছেন! অথচ কুরআন ও হাদীস দ্বারা এ কথা প্রমাণিত রয়েছে যে, মানুষ সে যে-ই হোক না কেন, মৃত্যুর পর তার সকল কর্ম বন্ধ হয়ে যায়, সে জীবিতদের দো'আর প্রতি আশান্বিত হয়ে থাকে। আমাদের পক্ষ থেকে তারা কোনো উপকার পেলে তারা আমাদের কল্যাণের জন্য দো'আ করলেও তাদের এ দো'আর কোনো কার্যকারিতা নেই বলে তা আমাদের কোনো কল্যাণে আসে না; কারণ, তারা মৃত, আর মৃত মানুষের এমন কোনো কর্ম নেই, যার দ্বারা তিনি নিজে বা অপর কেউ উপকৃত হতে পারে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেখানে বলেছেন :

«إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ...»

''মানুষ যখন মরে যায় তখন তার যাবতীয় আমল বন্ধ হয়ে যায়...।''[18] এরপরও সাধারণ মানুষেরা যেমন ওলিদের ব্যাপারে এ হাদীসের বিপরীত চিন্তা করে, তেমনি আমাদের দেশের কোনো কোন নামধারী ওলি বা পীরদেরকেও অনুরূপ চিন্তা করতে দেখা যায়। উদাহরণস্বরূপ সাতক্ষীরা জেলার বশিরহাটের পীর জনাব মুহাম্মদ রুহুল আমিন সাহেবের কথা বলা যায়। তিনি তার জীবনের শেষ প্রহরে তার ভক্তদের উদ্দেশ্যে এ উপদেশ দিয়ে গেছেন যে, ''আমার কবরে সাওয়াব পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে তোমরা যেখানেই ইসালে ছওয়াবের মাহফিল করো না কেন, তা আল্লাহ গ্রহণ করবেন, আমার ইসালে ছওয়াবের জন্য যারাই হাদিয়া পেশ করবে আমি আমার কবরে শুয়ে তার জন্য দো'আ করতে থাকবো।''[19]

ফুটনোট

[1]. শায়খ আব্দুর রহমান আল-জাযাইরী তিনি মূলত আলজিরিয়ার অধিবাসী হয়ে থাকলেও পরবর্তীতে সৌদী আরবের নাগরিকত্ব লাভ করেন। তিনি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, মদীনা এর একজন অধ্যাপক ছিলেন। মসজিদে নববীতে স্থায়ীভাবে তাফসীরের দারস দিতেন। তিনি বিভিন্ন গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে 'আয়সারুত তাফাসীর, মিনহাজুল মুসলিম ও 'আক্বীদাতুল মু'মিন ইত্যাদি গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য। - লেখক

[2]. আবু বকর জাবির আল-জাযাইরী, ওয়া জা-উ ইয়ারকুদুনা!!! মাহলান ইয়া দু'আতাদ দলালাহ; পৃ. ৬০।

[3]. শেখ সুলাইমান ইবন আব্দুল্লাহ ইবন মুনী', প্রাগুক্ত; পৃ. ২৩১।

[4]. মুহাম্মদ ফজলুল করীম, তৌহীদ-রেসালত ও নূরে মুহাম্মদী (সা.)-এর সৃষ্টি রহস্য; (কুমিল্লা : জমইয়াতু উলামাই আহলিস সুন্নাত ওয়াল জামা'আত, ১ম সংস্করণ, ১৯৯১ খ্রি.), পৃ. ৪৮-৫০।

[5]. মাওলানা ফজলুল হক নামে 'ফাজিলে দেওবন্দ' ডিগ্রী অর্জনকারী মাদ্রাসা-ই- আলীয়া, ঢাকা'র একজন বিশিষ্ট শিক্ষক ছিলেন। দেওবন্দে অধ্যয়নকালে তিনি এ সম্পর্কিত কিছু ঘটনা শ্রবণ করেছিলেন। তন্মধ্যকার একটি ঘটনা নিম্নরূপ: একদা এক ব্যক্তি খুনের দায়ে অভিযুক্ত হলে তার বিরুদ্ধে মকদ্দমা হয়। লোকটিকে নির্দোষ সাব্যস্ত করে খালাস করে আনার জন্য তার আত্মীয়-স্বজনরা মকদ্দমা চলাকালীন সময়ে একজন বিশিষ্ট আলেমের মাধ্যমে সে সময়ে যিনি দিল্লীর গাউছ ছিলেন, তাঁর শরণাপন্ন হয়। গাউছ বিষয়টি তাঁদের দেওয়ানে আলোচনা করেন এবং লোকটিকে নির্দোষভাবে খালাসের সিদ্ধান্ত পাশ করেন। পরবর্তীতে আদালতের বিচারকও সে অনুযায়ী তাকে নির্দোষ বলে রায় প্রদান করেন। [গাঁজাখুরী গল্প (সম্পাদক)]

[6]. কেউ কেউ মুগীরাহ ইবনে শু'বাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুর দাস হেলাল এর ব্যাপারে এ সম্পর্কিত হাদীস বর্ণনা করেছেন, সে হাদীসে রয়েছে : তিনি কুতুবদের মধ্যকার একজন ছিলেন। এ হাদীসটি হাদীস বিশেষজ্ঞদের ঐকমত্যের ভিত্তিতে বাতিল বলে গৃহীত হয়েছে। আবু নাঈম তাঁর 'হিলয়াতুল আউলিয়া' গ্রন্থে এবং শেখ আব্দুর রহমান আস-সুলামী তাঁর কোনো কোনো গ্রন্থে এ সম্পর্কিত কিছু হাদীস বর্ণনা করেছেন, তা দেখে কারো ধোঁকায় পড়ার কোন অবকাশ নেই; কারণ, তাদের কিতাবাদিতে সহীহ, হাসান, যয়ীফ ও মাওদু' তথা মিথ্যা হাদীসের সমাহার রয়েছে যেগুলো মিথ্যা হওয়ার ব্যাপারে হাদীস বিশারদদের মধ্যে কোনো মতবিরোধ নেই। এ ছাড়া আবুস শেখ নামক মুহাদ্দিস এর বর্ণিত হাদীসসমূহের মধ্যে এমন সব বর্ণনাকারীদের হাদীস রয়েছে, যারা হাদীসের মধ্যে বিশুদ্ধ আর বাতিল বলে কোনো পার্থক্য না করে যা-ই শ্রবণ করেছেন তা-ই বর্ণনা করার নীতি অবলম্বনকারী ছিলেন, যদিও প্রকৃত হাদীস বেত্তাগণ এ ধরনের হাদীস বর্ণনা করতেন না, এ কারণে যে, রাসূল-সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-থেকে বিশুদ্ধ সনদে প্রমাণিত হয়েছে তিনি বলেছেন :

«مَنْ حَدَّثَ بِحَدِيْثٍ وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الكَاذِبِيْن»

“একটি হাদীস মিথ্যা জানা সত্ত্বেও যে আমার পক্ষ থেকে তা বর্ণনা করলো, সে মিথ্যুকদের মধ্যকারই একজন।” দেখুন: ইবনে তাইমিয়্যাহ, যিয়ারাতুল কুবূরি ওয়াল ইস্তেনজাদি বিল মাকবূর; (রিয়াদ : আর রিয়াসাতুল আ-স্মাহ..., দারুল ইফতা, ১ম সংস্করণ, ১৪১০হি:), পৃ.৬৫।

[7]. ইমাম ইবনে তাইমিয়্যাহ (রহ.)-কে গাউছ ও কুতুব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন : কোনো কোনো দলের লোকেরা এ সব কথা বলে থাকে, এবং ইসলাম ধর্মের মধ্যে বাতিল বিষয়ে এ সবের ব্যাখ্যা করে, যেমন কেউ কেউ বলে : গাউছ হলেন তিনি যার মাধ্যমে সমগ্র সৃষ্টির সাহায্য ও জীবিকা এসে থাকে, এমনকি তারা আরো বলে যে, ফেরেশতা ও সমুদ্রের মাছের সাহায্য ও গাউছের মাধ্যমে হয়ে থাকে। এ জাতীয় ধারণা ঈসা আলাইহিস সালাম-এর ব্যাপারে খ্রিষ্টানরা এবং ‘আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর ব্যাপারে বাড়াবাড়িকারীরা তাঁর ব্যাপারে যা বলে, সে সব কথারই অনুরূপ। এ জাতীয় ধারণা ও কথা প্রকাশ্য কুফরী। যারা এ সব বলবে তাদেরকে তাওবা করাতে হবে। তাওবা না করলে এদেরকে (মুরতাদ হওয়ার কারণে) হত্যা করা হবে; কেননা, সৃষ্টির মাঝে এমন কোনো ফেরেশতা বা মানুষ নেই যার মাধ্যমে সকল সৃষ্ট জীবের সাহায্য এসে থাকে ...। ‘গাউছ’ শব্দের দ্বারা আমি এটাই উদ্দেশ্য করেছি যা এদের কেউ কেউ বলে যে, পৃথিবীতে ৩১৩ জনেরও অধিক ব্যক্তি রয়েছেন যাদেরকে ‘নুজাবা’ বলা হয়, তাঁদের মধ্য থেকে পুনরায় ৭০ জনকে বাছাই করা হয়, যাদেরকে বলা হয় ‘নুক্বাবা’। এদের মধ্য থেকে ৪০ জনকে বাছাই করা হয়, তাঁদেরকে বলা হয় ‘আবদাল’’। এদের মধ্য থেকে আবার সাত জনকে বাছাই করা হয়, তাঁদেরকে বলা হয় ‘আকতাব’। এদের মধ্য থেকে আবার চার জনকে বাছাই করা হয়, তাঁদেরকে বলা হয় ‘আওতাদ’। এদের মধ্য থেকে আবার একজনকে বাছাই করা হয়, যাকে বলা হয় ‘গাউছ’।... এরপর তিনি বলেন: এ সম্পর্কে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত যা বলা হলো, এর সবই বাতিল। প্রাগুক্ত; পৃ. ৬৩-৬৪।

[8]. তিনি ১৭০৮ সালে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর সময়ে তিনি মক্কা শরীফে হানাফী মাযহাবের একজন প্রখ্যাত ‘আলিম ছিলেন। একজন বিশিষ্ট ওয়াইয, ফক্বীহ ও মুহাদ্দিস ছিলেন। দেখুন: ‘উমার রেজা কাহহা-লাহ, মু‘যামুল মুআল্লিফীন; (বৈরুত : মুআসসাসাতুর রিছালাহ, ১ম সংস্করণ, ১৯৯৩ খ্রি.), ১/৮৪৩।

[9]. এ জাতীয় বিশ্বাস প্রত্যাখ্যান উপলক্ষে তিনি বলেন : “মুসলিমদের মাঝে এমন কিছু দলের আবির্ভাব ঘটেছে যারা এ দাবী করে যে, ওলিগণ জীবিত হোন আর মৃত হোন সর্বাবস্থায় জগত পরিচালনার ক্ষেত্রে তাঁদের দায়িত্ব রয়েছে, বিপদাপদে তাঁদের নিকট সাহায্য কামনা করা যায়,... তাঁদের মাঝে রয়েছেন আব্দাল, নুকাবা, আওতাদ ও নুজাবা..., কুতুবই হলেন সমগ্র মানুষের বিপদে সাহায্যকারী...। তিনি বলেন : এ জাতীয় কথার মধ্যে বাড়াবাড়ি রয়েছে, বরং এর মধ্যেই চিরস্থায়ী ধ্বংস ও শাস্তি অনিবার্য হয়ে রয়েছে। কেননা; এতে নিশ্চিতভাবে শির্ক রয়েছে। কুরআনের সাথে রয়েছে এর বিরোধ, সকল ইমাম ও মুসলিম উম্মাহের ঐকমত্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত আক্বীদার সাথেও এর বিরোধ ও বৈপরিত্য রয়েছে...। মুত্যুর পরেও ওলিগণ মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন করতে পারেন, এ জাতীয় বিশ্বাস সবচেয়ে জঘন্যতম বিশ্বাস...। আব্দাল ও গাউছ সম্পর্কে লোকেরা যা বলে তা তাদের মিথ্যা বানানো গল্প বৈ আর কিছুই নয়। দেখুন : শেখ সুলইমান ইবন আব্দুল্লাহ ইবন মুনী‘, প্রাগুক্ত; পৃ. ২৩২-২৩৪।

[10]. স্বর্গীয় রমেশ চন্দ্র সরকার, মুক্তির দরবার; (চট্রগ্রাম: শ্রী পুলিন বিহারী শীল, সংস্করণ বিহীন, ১৯৯২ খ্রি.), পৃ. ৮।

[11]. তবেদ; পৃ. ২।

[12]. তদেব; পৃ. ১১।

[13]. তদের; পৃ. ৮।

[14]. কাজী মাহবুবুল আলম এর ঠিকানা : লিংক ইন্টারন্যাশনাল, আল-চেম্বার নং ১২২/১২৪, মতিঝিল , ঢাকা।

[15]. এ দাওয়াত দাতার নাম : সৈয়দ আলমগীর চিশতী, এম. রহমান এন্ড কোং, ৩৭/ কে. বি.আব্দুস সাত্তার রোড, রহমতগঞ্জ, চট্রগ্রাম, বাংলাদেশ।

[16]. ১৯৭৮ সালে পীরজাদা মৌলভী সৈয়দ ফজলুর রহমান বোরাকী হতে সে বছরের ওরস উপলক্ষে প্রচারিত দাওয়াতী পত্র থেকে গৃহীত।

[17]. মুসলিম, প্রাগুক্ত; কিতাবুল জানাইয, বাব নং ৩৬, হাদীস নং ৯৭৭;২/৬৭২; নাসাঈ, প্রাগুক্ত; ৮/৩১০; তিরমিযী, প্রাগুক্ত; কিতাবুল জানাইয, বাব নং ৬০, হাদীস নং ১০৫৪;৩/৩৭০।

[18]. মুসলিম, প্রাগুক্ত; কিতাবুল ওয়াসিয়্যাহ, বাব নং ৩, হাদীস নং ১৬৩১, ৩/১২৫৫; তিরমিযী, প্রাগুক্ত; কিতাবুল আহকাম ..., বাব নং ৩৬, হাদীস নং ১৩৭৬;৩/৬৬০; আবু দাউদ, প্রাগুক্ত; ৩/১১৭; আদ-দা-রিমী, আব্দুল্লাহ ইবন আব্দুর রহমান, আবু মুহাম্মদ, সুনানিদ দারিমী; সম্পাদনা : ফওয়ায আহমদ ও গং, (বৈরুত : দারুল কিতাবিল আরবী, ১ম সংস্করণ, ১৪০৭হি:), ১/১৪৮; সহীহ ইবনে হিববান; ৭/২৬৬।

[19]. এ উপদেশের কথাটি সাতক্ষিরা জেলার কুলিয়া মাদ্রাসার সেক্রেটারী ক্বারী মুহাম্মদ আশরাফুল আলম পীর রুহুল আমিন সাহেবের ইসালে ছওয়ার উপলক্ষে অনুষ্ঠিত একটি ইসলামী সভায় জনগণকে শরীক হওয়ার জন্য দাওয়াতী পত্রে উল্লেখ করেছেন।

Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=12582

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন